CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ২ সংখ্যা ১ | আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স | মার্চ ২০০৪

ভেতরের পাতায় . . .

৭ ২০০৪ সালে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে নিপা এনসেফালাইটিস-এর প্রাদুর্ভাব

১২ জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে রক্ত-আমাশয় রোগ জীবাণুর বর্ধিত প্রতিরোধ-ক্ষমতা

১৫ সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এমন জ্বরজাতীয় রোগের কারণ হিসেবে লেপটোস্পিরোসিস, ঢাকা, ২০০১

২০০০ সালে ডেঙ্গুজ্বরের রোগী সনাক্ত করার জন্য ঢাকার দু'টি বড় হাসপাতালে আইসিডিডিআর,বি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি শুরু করে। ২০০১ সালে নির্বাচিত রোগীদের বিশেষ রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, অনেকের জ্বরের কারণ ডেঙ্গু নয়। এ-পর্যবেক্ষণে শহর-এলাকায় মারাত্মক জ্বরজাতীয় রোগের কারণ হিসেবে ধরা পড়ে লেপটোস্পিরোসিস নামের একটি রোগ। ডেঙ্গু রোগীদের তুলনায় লেপটোস্পিরোসিস-এ আক্রান্ত রোগীরা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ছিলো দরিদ্র শ্রেণীর এবং হাসপাতালে আসার সময় তাদের জ্বর ছিলো বেশি। লেপটোস্পিরোসিস-এ আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিলো শতকরা ৫ ভাগ।

ডেঙ্গুজ্বর ও রক্তক্ষরণকারী ডেঙ্গুজ্বর পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ডিএমসিএইচ) ও হলি ফেমিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল (এইচএফআরসিএইচ)-এ গৃহীত কর্মসূচির অধীনে হাসপাতালে আসতে হয় এমন জ্বরজাতীয় রোগসৃষ্টিতে লেপটোস্পিরোসিস-এর ভূমিকা কতটা তারও মূল্যায়ন করা হয় (১)। ডেঙ্গু-সদৃশ রোগে আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রক্তের নমুনা এবং ক্লিনিক্যাল ও রোগতাত্ত্বিক (এপিডেমিওলজিক) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আইজিজি ও আইজিএম ক্যাপচার এলিজা পদ্ধতিতে (২) ডেঙ্গু ভাইরাস এন্টিবডির উপস্থিতি জানার জন্য রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। অধিকন্তু ডেঙ্গু ভাইরাসের রাইবোনিউক্লিক এসিড (আরএনএ)-এর উপস্থিতি দেখার জন্য রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ-পলিমারেজ চেইন রিএ্যাকশন (আরটি-পিসিআর)-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় রোগ শুরু হওয়ার প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে সংগৃহীত রক্তের নমুনা (৩)। লেপটোস্পিরাজাত দ্রব্যাদি সনাক্ত করার জন্য ডেঙ্গু হয় নি এমন রোগীদের দেহ থেকে আগেই সংগৃহীত রক্তের নমুনা জর্জিয়ার আটলান্টায় অবস্থিত সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর ল্যাবরেটরিতে পিসিআর-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়।

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১,২৯৭ জন রোগীর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়; প্যায়ার্ড সেরোলজি কিংবা আরটি-পিসিআর-এর মাধ্যমে ৯৩৫ (৭২%) জন রোগীর ডেঙ্গুজ্বর হয়েছে বলে সনাক্ত করা হয়। যে ৩৬২ জন রোগীর ডেঙ্গু হয় নি বলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ধরা পড়ে, তাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয় লেপটোস্পিরোসিস-এর উপস্থিতি দেখার জন্য।

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

এদের মধ্যে ৬৩ (১৭%) জন রোগীর লেপটোস্পিরোসিস হয়েছে বলে পিসিআর-এর মাধ্যমে ধরা পড়ে।

লেপটোস্পিরোসিস-এর প্রাদুর্ভাবের শীর্ষ সময় ছিলো অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর। একইভাবে, সর্বোচ্চ ডেঙ্গু কার্যক্রমের সময় ছিলো জুলাই থেকে ডিসেম্বর, অক্টোবর ছিলো যার শীর্ষ সময় (চিত্র ১)।

চিত্র ১: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও হলি ফেমিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে-আসা ডেঙ্গু ও লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের মাসওয়ারী হিসাব, ২০০১

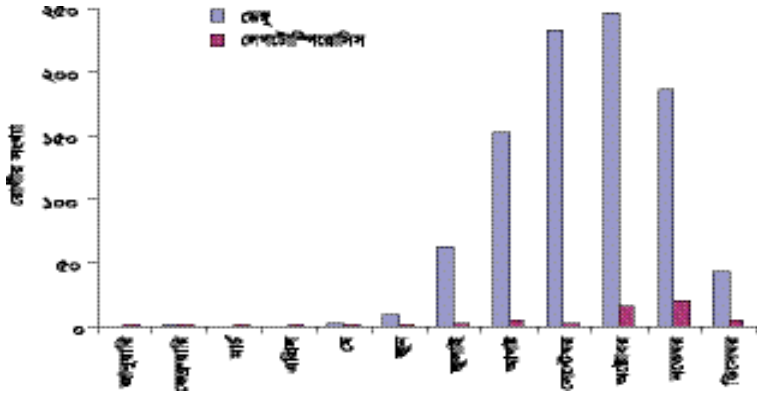

লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের বয়স ও লিঙ্গ-পরিচয় ডেঙ্গু রোগীদের থেকে ভিন্ন ছিলো না (সারণি ১)। ডেঙ্গু রোগীদের চেয়ে লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের পারিবারিক আয় ও শিক্ষাদীক্ষা ছিলো কম।

সারণি ১: ডেঙ্গু ও লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

আর্থ-সামাজিক অবস্থা	ডেঙ্গু রোগী (সংখ্যা=৯৩৫)	লেপটোস্পিরোসিস রোগী (সংখ্যা=৬৩)	পি মান*
বয়স (বছর)	২৭.৫ ± ১১.১	২৭.৯ ± ১৩.৩	উল্লেখযোগ্য নয়
পুরুষ	৬৯১ (৭৪%)	৪৬ (৭৩%)	উল্লেখযোগ্য নয়
মাসিক পারিবারিক আয় (টাকা)			
< ৩,০০০	১৭৪ (১৯%)	২০ (৩২%)	০.০২
৩,০০০-৫,৯৯৯	২০৩ (২২%)	১৭ (২৭%)	
৬,০০০-১০,০০০	১২৭ (১৪%)	৭ (১১%)	
>১০,০০০	৪৩১ (৪৬%)	১৮ (২৯%) †	
পরিবারের আকার	৫.৪ ± ২.৭	৪.৮ ± ২.১	উল্লেখযোগ্য নয়
শিক্ষাদীক্ষার স্তর			
নিরক্ষর	৮৩ (১০%)	১৬ (২৭%)	<০.০০১
প্রাথমিক	১৪৪ (১৭%)	১৩ (২২%)	
মাধ্যমিক	৪২৩ (৪৯%)	২২ (৩৭%)	
বিশ্ববিদ্যালয়	২১২ (২৫%)	৮ (১৪%) §	

*উপরোক্ত উপাত্ত গড় ±এসডি-এর মান; প্যায়ারসন কাই-স্কয়ার বা এ্যানোভা টেস্টের মাধ্যমে পি-এর মান বের করা হয়েছে

† একটি রোগীর তথ্য পাওয়া যায় নি

§ চারটি রোগীর তথ্য পাওয়া যায় নি

লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের জ্বরের প্রকৃতি ডেঙ্গু রোগীদের থেকে ভিন্ন ছিলো (সারণি ২)। লেপটোস্পিরোসিস রোগীরা ডেঙ্গু রোগীদের চেয়ে দীর্ঘ সময় জ্বরে ভুগেছে এবং তাদের জ্বর সাধারণত থেমে-থেমে এসেছে, বিরতিহীন ছিলো না।

প্রথম হাসপাতালে আসার সময় লেপটোস্পিরোসিস ও ডেঙ্গু রোগীরা একই ধরনের লক্ষণ প্রকাশ করেছে (সারণি ২)। উভয় জ্বরের ক্ষেত্রেই জ্বর ছাড়াও মাথাব্যথা, মনমরা ভাব এবং বমি-বমি ভাব থেকে বমি-হওয়া ছিলো সেসব সাধারণ লক্ষণের অন্যতম। যদিও লেপটোস্পিরোসিস ও ডেঙ্গুজ্বরের একটি সাধারণ লক্ষণ গায়ে দানা-দানা লালচে দাগ-পড়া, তবুও ডেঙ্গুজ্বরের রোগীদের মধ্যে তা বেশি দেখা গেছে।

প্রাথমিক দৈহিক পরীক্ষার সময় অন্তর্বর্তী (মেডিয়ান) তাপমাত্রা এবং নাড়ীস্পন্দনের হার ডেঙ্গু রোগীদের তুলনায় লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিলো। শরীরে দানা-দানা লালচে দাগসহ (পেটিশিয়াল র‍্যাশ) রক্তক্ষরণ, পেশী-বন্ধনী (টারনিকোয়েট) পরীক্ষায় পজিটিভ ফলাফল এবং মাড়ীতে রক্তক্ষরণ ডেঙ্গু রোগীদের সবার মধ্যেই দেখা গেছে, যদিও লেপটোস্পিরোসিসের বেলায় সেগুলি কিছু রোগীর মধ্যে দেখা গেছে। চোখের সাদা অংশে রক্তক্ষরণ লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা গেছে, যদিও অন্য কোনো কারণে চোখ লাল হয়ে-যাওয়াকে এর সাথে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় রক্তে সর্বমোট শ্বেতকণিকার পরিমাণ লেপটোস্পিরোসিস রোগী ও ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে একই রকম ছিলো, তবে ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে লিমফোসাইট-এর পরিমাণ ছিলো বেশি।

এ-সমীক্ষায় ৩৭২ জন রোগীর আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়। এতে দেখা যায় যে পাকস্থলীর দেয়ালে (ascites) (৫৪% বনাম ২৩%, পি=০.০০২) এবং ফুসফুসের দেয়ালে (pleural effusion) (৫৮% বনাম ২৭%, পি=০.০০২) তরল পদার্থের নিঃসরণ লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের তুলনায় ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে বেশি দেখা গেছে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে শিরা-উপশিরা চুইয়ে বেরিয়ে-আসা ক্ষরণের ফলে এমনটি হতে পারে। রক্তে প্রবহমান তরল পদার্থের ঘাটতিও ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে বেশি ছিলো।

তিন জন (৫%) লেপটোস্পিরোসিস রোগী মারা গেছে, যাদের শারীরিক অবস্থা-সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল জানা ছিলো; সে-তুলনায় ডেঙ্গু রোগীদের মৃত্যুহার ছিলো শতকরা ১.২। যে ৩ জন লেপটোস্পিরোসিস রোগী মারা গেছে তাদের ২ জনের আয় ও শিক্ষাদীক্ষার উপাত্ত জানা ছিলো; ২ জনের কারো কোনো শিক্ষাদীক্ষা ছিলো না এবং মাসিক আয় ছিলো ৩,০০০ টাকার কম।

*সারণি ২: ডেঙ্গু ও লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্যের তারতম্য**

ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য	ডেঙ্গু রোগী (সংখ্যা=৯৩৫)	লেপটোস্পিরোসিস রোগী (সংখ্যা=৬৩)	পি মান
প্রাথমিক লক্ষণ			
হাসপাতালে আসার সময় পর্যন্ত জ্বরের অন্তর্বর্তী (মেডিয়ান) স্থায়িত্বকাল	৫ (১-৪০)	৬ (২-১২)	০.০৪
জ্বরের ধরন			
বিরতিহীন	৮৯১ (৯৫%)	৫৩ (৮৫%)	০.০০১
থেমে-থেমে আসা	৪৪ (৫%)	৯ (১৫%)	
শরীরে দানা-দানা লালচে দাগ	৫৬১ (৬০%)	২৪ (৩৯%)	০.০০১
মাথাব্যথা	৮৪৩ (৯০%)	৫১ (৮২%)	০.০৫
মনমরা ভাব	৮৩৩ (৮৯%)	৫৩ (৮৫%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
পেটব্যথা	৪৪৩ (৪৭%)	২৪ (৩৯%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
শরীরে প্রচন্ড চুলকানি	২০২ (২২%)	৬ (১১%)	০.০৫
নাকে অস্বস্থি ও নাক দিয়ে পানি-ঝরা	৯ (১%)	৩ (৫%)	০.০৩
বমি-বমি ভাব	৮৯৬ (৯৬%)	৬০ (৯৭%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
বমি হওয়া	৭৭৭ (৮৩%)	৫২ (৮৪%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
ডায়রিয়া	৩৩৪ (৩৮%)	২৩ (৩৭%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
কালচে-পায়খানা	৪৭৭ (৫২%)	৩২ (৫৩%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
মলের সথে রক্ত-পড়া	৯ (১%)	০ (০%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
দৈহিক লক্ষণ			
হাসপাতালে আসার সময় পর্যন্ত অন্তর্বর্তী তাপমাত্রা (^{0}F)	৯৮.৬ (৯৪-১০৬)	১০১.৪ (৯৮-১০৮)	<০.০০১
অন্তর্বর্তী নাড়ীর স্পন্দন	৮২ (৪৮-১৬০)	৯০ (৬০-১৮০)	০.০০১
লিভার বড় হয়ে যাওয়া	৭৮ (৮%)	৭ (১১%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
জন্ডিস	১৭ (২%)	৩ (৫%)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
শরীরে দানা-দানা লালচে দাগ	৩৪৭ (৩৮%)	১২ (২০%)	<০.০১
পেশী-বন্ধনী (টারনিকোয়েট) পরীক্ষার পজিটিভ			
ফলাফল (>২০/বর্গ ইঞ্চি)	৭৯৮ (৭৬%)	২০ (৩৩%)	<০.০০১
মাড়ীতে রক্তক্ষরণ	৩২৭ (৩৬%)	১২ (২০%)	<০.০১
চোখের সাদা অংশে রক্তক্ষরণ	২৯৬ (৩২%)	৩১ (৫১%)	<০.০১
ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল			
রক্তে শ্বেতকণিকার গড় সংখ্যা	৬.৯±৫.৩	৭.০±৫.৭	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
% নিউট্রোফিল	৪৪±১৩	৫৯±১৮	<০.০০১
% লিমফোসাইট	৪৭±১৪	৩১±১৫	<০.০০১
গড় প্লেটলেট কাউন্ট (X১০^3)	৮৫±৭৪	১২৮±৮৩	<০.০০১
গড় হেমাটোক্রিট	৪১±৫.৮	৩৭±৮	<০.০০১
হাসপাতালে চিকিৎসার ফলাফল**			
ভাল হয়ে কিংবা উপদেশসহ বাড়ি-ফেরা	৯১৫ (৯৮.৮%)	৫৭ (৯৫%)	০.০৫
মৃত্যু	১১ (১.২%)	৩ (৫%)	

* উপরোক্ত উপাত্ত সংখ্যা (%), গড় ± এসডি কিংবা মেডিয়ান (রেঞ্জ)-এর মান; পি-এর মান ক্যাটাগরিক্যাল উপাত্তের জন্য প্যায়ারসন কাই-স্কয়ার-এর মাধ্যমে এবং ধারাবাহিক উপাত্তের জন্য ম্যান-হুইটনী ইউ কিংবা এ্যানোভা টেস্টের মাধ্যমে বের করা হয়েছে

** সব রোগীর চিকিৎসার ফলাফল পাওয়া যায় নি

প্রতিবেদক: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, হলি ফেমিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ঢাকা, বাংলাদেশ; ডিভিশন অফ ব্যাকটেরিয়্যাল এ্যান্ড মাইকোটিক ডিজিজেজ এবং ডিভিশন অব ডেঙ্গুর-বোর্ন ইনফেকশাস ডিজিজেজ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজেজ, সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-আটলান্টা, ম্যাসাচুসেটস্ জেনারেল হাসপাতাল, বোস্টন, যুক্তরাষ্ট্র; ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন ও হেলথ সিস্টেমস এ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি, ঢাকা, বাংলাদেশ

অর্থানুকুল্য: কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) এবং সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

এই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা শহরে মারাত্মক জ্বরজাতীয় রোগের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ লেপটোস্পিরোসিস, যার ফলে হাসপাতালে আসার প্রয়োজন পড়ে। লেপটোস্পিরোসিস প্রাণীঘটিত একটি রোগ, যা সারা বিশ্বে বিদ্যমান। *লেপটোস্পিরা*-বংশীয় রক্তক্ষণকারী স্পিরোচেট দ্বারা এ-রোগ সংঘটিত হয়। প্রাণীদের মূত্রনালীর দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) সংক্রমণ বা ঘা-এর মধ্যে এ-রোগ জিইয়ে থাকে। এসব প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ধাড়ী ইঁদুর এবং গৃহপালিত ও খামারের প্রাণী। কোনো মানুষের ক্ষতযুক্ত চামড়া যখন আক্রান্ত প্রাণীর মূত্রের দ্বারা দূষিত পানি কিংবা মাটির সংস্পর্শে আসে তখন সে এ-রোগে আক্রান্ত হয় (৪)। অতিরিক্ত গরম ও আর্দ্রতাযুক্ত দেশের পরিবেশে এর জীবাণু দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে এবং এসব দেশেই লেপটোস্পিরোসিস-এর প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। যেসব দেশের জনগণ অহরহ দূষিত পানির সংস্পর্শে আসে সেখানেও এ-রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

ঢাকায় সনাক্ত-করা লেপটোস্পিরোসিস রোগীরা ছিলো দরিদ্র শ্রেণীর এবং স্বল্পশিক্ষিত। ধাড়ী ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণীর মূত্রে দুষিত পরিবেশের সংস্পর্শে ঘন ঘন আসার সম্ভাবনা এ-শ্রেণীর মানুষেরই বেশি। পক্ষান্তরে ডেঙ্গু রোগীদের পারিবারিক আয় ও শিক্ষাদীক্ষা ছিলো বেশি। পরবর্তী গবেষণায় যদি এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে রোগের সম্পর্কটি প্রমাণিত হয় তবে রোগ-প্রতিরোধ কৌশল উদ্ভাবনে তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

ডেঙ্গু-কবলিত এলাকায় পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, লেপটোস্পিরোসিস রোগটিকে ডেঙ্গুর সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় (৫)। ঢাকায় লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের রোগ সনাক্ত করার জন্য বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি এবং রোগের উপসর্গগুলো ডেঙ্গু বা অন্য কোনো ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ থেকে ভিন্ন ছিলো না। যদিও লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের ক্ষেত্রে জ্বরের মাত্রা ও স্থায়িত্বকাল ডেঙ্গু রোগীদের চেয়ে বেশি ছিলো, এদের ক্লিনিক্যাল অবস্থায় এমনই সাদৃশ্য ছিলো যে, চিকিৎসকগণ বিশেষ করে রোগের প্রাদুর্ভাবের শীর্ষ সময়টিতে এই দু'টি রোগ সনাক্তকরণে সমান সন্দেহের মধ্যে থেকে রোগ-নির্ণয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

লেপটোস্পিরোসিস রোগটির দু'টি পর্যায় থাকতে পারে। রোগের শেষ পর্যায়ে অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস-এর জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা হোস্ট ইম্যুন রেসপন্স-এর সাথে যুক্ত। রোগের তীব্র অবস্থায় জন্ডিস, মূত্রনালীর সমস্যা এবং রক্তক্ষরণ দেখা দিতে পারে। পূর্বসূত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত এই সেরোলজিক গবেষণাকর্মে ঢাকার লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হয় নি।

লেপটোস্পিরোসিস রোগটি নির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন তা বিশেষভাবে সজ্জিত ল্যাবরেটরিগুলোতেই শুধু সম্ভব যেখানে কালচার, সেরোলজি ও পিসিআর পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। ডক্সিসাইক্লিন (৬) বা পেনিসিলিন (৭) দ্বারা চিকিৎসায় রোগের স্থায়িত্ব ও মূত্রের মাধ্যমে জীবাণুর বহির্গমণের সময়কাল কমে আসে, যদিও রোগটির স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ইতিহাসের কারণে এ-জাতীয় বিশেষ চিকিৎসায় কতটা ফল পাওয়া যায় সে-বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

ঢাকায় লেপটোস্পিরোসিস রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিলো শতকরা ৫ ভাগ। এ-ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রোগটি সম্বন্ধে, জনজীবনে এর প্রাদুর্ভাবের সঠিক উপাত্ত সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশে এর চিকিৎসা-ব্যবস্থার যথাযথ তথ্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও হলি ফেমিলি হাসপাতালে-আসা রোগীর সংখ্যা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ডেঙ্গুজ্বরের কিংবা রক্তক্ষরণকারী ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণযুক্ত রোগীদের লেপটোস্পিরোসিস হয়েছে কি না সেটি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

২০০৪ সালে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে নিপা এনসেফালাইটিস-এর প্রাদুর্ভাব

২০০৪ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে নিপা এনসেফালাইটিস-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত কিংবা সম্ভাব্য রোগী হিসাবে ২৯ জনকে সনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ২২ জনই মারা যায়। সর্বাধিক সংক্রমণের ঘটনা রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দে ঘটলেও জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলাতেও নিপাজনিত অসুস্থতা সনাক্ত করা হয়। এ-প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে রোগ ছড়ানোর স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ফলখেকো *টেরোপাস*-জাতের বাদুড় এই ভাইরাসের প্রধান উৎস বলে প্রতীয়মান হয়। রোগ সংক্রমণের প্রক্রিয়া নিরূপণের লক্ষ্যে গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০০৪ সালের ১২-১৭ জানুয়ারি রাজবাড়ি জেলাধীন গোয়ালন্দের দু'টি পাশাপাশি গ্রামে ১২ জন লোক জ্বরজাতীয় অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে অচেতন স্তরে (কমায়) চলে যায়। এদের মধ্যে ১০ জনই মারা যায়। দু'জন বাদে সবারই বয়স ছিলো ৭ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এবং ৮ জন ছিলো পুরুষ। লোকগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি বসবাস করতো। এদের মধ্যে ৩ ভাই একসঙ্গে এক বাড়িতে বসবাস করতো এবং অন্য ২ ভাই অন্য একটি বাড়িতে এক সঙ্গে বাস করতো। এদের মধ্যে ১ জন মা এবং তার সদ্য হাঁটতে-শেখা বয়সের ১টি শিশুও ছিলো। ২১ জানুয়ারি তারিখে এই জনপদের খবর পেয়ে ২২ তারিখেই বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আইসিডিডিআর,বি এবং ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি এ্যান্ড ডিজিজ কন্ট্রোল রিসার্চ (আইইডিসিআর) একটি যৌথ তদন্ত শুরু করে। এ-তদন্তের কাজে সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কিছু কর্মী ৪ ফেব্রুয়ারি এসে হাজির হন।

রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, নিপা ভাইরাসের কারণে সেই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো। আইজিজি ও আইজিএম এন্টিবডির জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে রক্ত ও মেরুদন্ডের তরল মজ্জা (সিএসএফ), এবং কালচারযোগ্য ভাইরাস ও তাতে নিপা ভাইরাস আরএনএ-র উপস্থিতি জানার জন্য রিভার্স ট্র্যান্সক্রিপটেজ-পলিমারেজ চেইন রিএ্যাকশন (আরটি-পিসিআর)-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে গলার শ্লেষ্মা (সোয়াব) ও সিএসএফ।

কথিত প্রাদুর্ভাবের সময় তদন্তকারী দলটির প্রধান লক্ষ্য ছিলো নিপা ভাইরাসজনিত সংক্রমণের মাত্রা ও ভৌগলিক বিস্তার নিরূপণ করা এবং ভাইরাসের উৎস ও রোগ বিস্তারের প্রক্রিয়া সনাক্ত করা। আশ-পাশের বহু জেলার সিভিল সার্জনদের সাথে যোগাযোগ ক'রে তাদের অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন এতদসদৃশ কোনো রোগের সন্ধান পেলে খবর জানান। জ্বরের সঙ্গে অ স্বাভাবিক অস্থিরতা, বিড়বিড়-করা ও অচেতন হয়ে-যাওয়াসহ মানসিক অবস্থার পরিবর্তনকে রোগের লক্ষণ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য যখন সম্ভব হয়েছে তখন এসব রোগীদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে—অবশ্য বহু রোগী নমুনা সংগ্রহের আগেই মারা গেছে। কোনো রোগীর রক্তে বা মজ্জায় (সিএসএফ) নিপা ভাইরাসের আইজিজি এন্টিবডি পাওয়া গেলে তাকে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত বলে ধরা হয়েছে এবং একে ল্যাবরেটরি

পরীক্ষায় প্রমাণিত রোগ বলে মনে করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত কোনো রোগীর কাছাকাছি বাস করছে এমন কারো মধ্যে জ্বরের সঙ্গে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেলে তাকে সম্ভাব্য রোগী বলে ধরা হয়েছে। যেসব এলাকা থেকে রোগের লক্ষণাক্রান্ত মানুষের খবর পাওয়া গেছে সেসব এলাকার বহু প্রাণীর দেহ থেকেও নমুনা সংগ্রহের বিষয়টিকে তদন্তকারী দল অন্তর্ভুক্ত করেছে। নিপা ভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ পেতে মানুষ ও প্রাণীদের দেহ থেকে সংগৃহীত সেসব নমুনা পরীক্ষার জন্য আটলান্টার সিডিসি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশে নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি

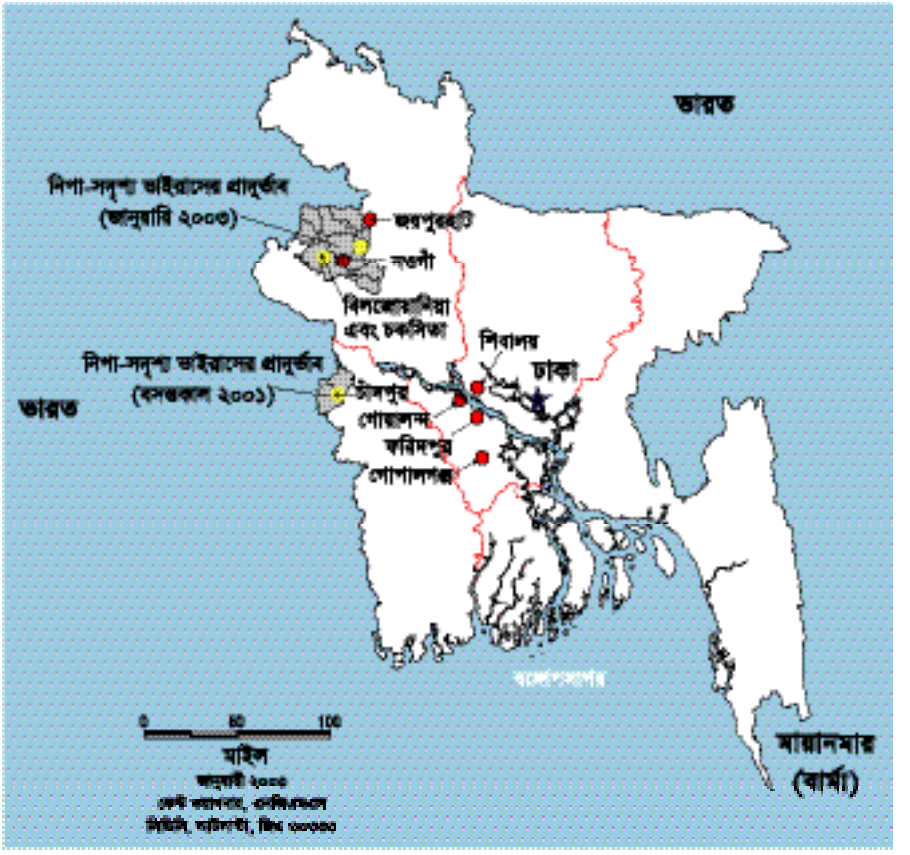

চিত্র ২: ২০০৪ সালে বাংলাদেশে নিপা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের জেলা ও সপ্তাহ-ভিত্তিক রেখাচিত্র (সংখ্যা=২৯)

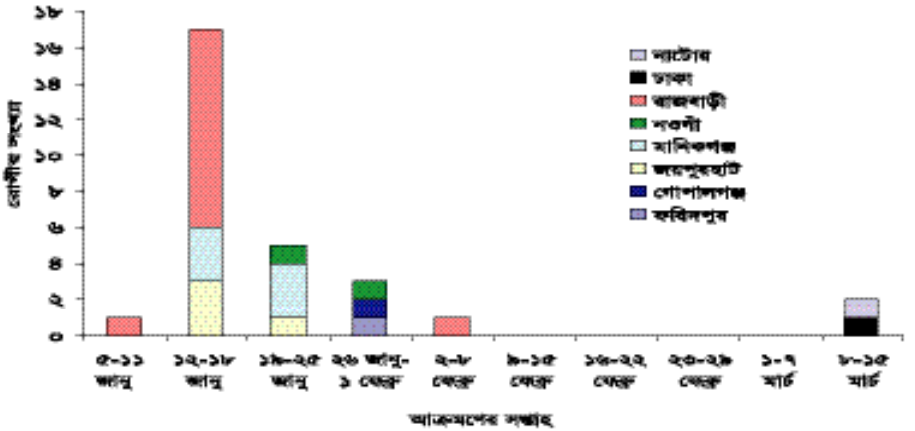

২০০৪ সালের ৫ এপ্রিল নাগাদ বাংলাদেশে নিপা ভাইরাস সন্দেহে ২৯ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিলো ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত নিশ্চিত রোগী। ২২ (৭৬%) জন মারা গেছে। যদিও রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দে অনেক রোগী ছিলো, সেখান থেকে এমনকি ১৫০ কি.মি. দূরবর্তী জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিছু স্থানেও নিশ্চিত নিপা-আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে (চিত্র ১)। এসব স্থানের সনাক্তকৃত রোগীরা প্রায় একই সময়ে কিংবা রাজবাড়ি জেলার রোগীদের চেয়ে অল্প কিছুদিন পর সংক্রামিত হয়েছে (চিত্র ২)। রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে এমন সেবাদান কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীদের এ-রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় নি।

তদন্ত কাজ এগিয়ে চলছে এবং আক্রান্ত-অনাক্রান্ত রোগীদের পরীক্ষা করে এই সংক্রমণের জন্য দায়ী ঝুঁকিগুলো কী কী তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা চলছে। কীভাবে এ-রোগ সংক্রামিত হয় তা নিরূপণ করতে এ-তদন্ত সহায়ক হবে। নিপা ভাইরাসের এন্টিবডি আছে কি না তা দেখার জন্য গোয়ালন্দের ২৬৬ জন লোককে নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমান ও অতীতের ভাইরাস সংক্রমণের পরিধি নিরূপণ এবং সংক্রমণ-পরবর্তী দৈহিক অবস্থার সার্বিক চিত্র জানার জন্য তাদের পরীক্ষা করা হবে (নিম্নমাত্রার অসুস্থতা কিংবা লক্ষণহীন সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে কি না তা মূল্যায়ন করা হবে)। বাদুড়, পেঁচা, শুকর, ঘোড়া, ছাগল, গরু, ধাড়ী ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, বিড়াল ও কুকুরসহ ৪৫০-এর অধিক প্রাণীকে নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহব্যাপী এসব প্রাণীদেহ থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হবে এদের দেহে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে কি না। প্রাথমিক ফলাফলে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, *টেরোপাস* শ্রেণীভুক্ত ফলখেকো বাদুড়ের দেহে এ-ভাইরাস রয়েছে, যার ফলে ইতোপূর্বেকার নিপা সংক্রমণ সংঘটিত হয়েছে ।

প্রতিবেদক: ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি এ্যান্ড ডিজিজ কন্ট্রোল রিসার্চ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা ও জেনেভা; ডিভিশন অব ভাইরাল এ্যান্ড রিকেটশিয়্যাল ডিজিজেজ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজেজ, সিডিসি-আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র; এবং ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন ও ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি, ঢাকা, বাংলাদেশ

অর্থানুকুল্য: সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

মন্তব্য

বাংলাদেশে নিপা ও নিপা-সদৃশ ভাইরাসজনিত রোগের এটা তৃতীয় স্বীকৃত প্রাদুর্ভাব (১)। এই প্রাদুর্ভাবের তদন্ত কাজে ব্যবহৃত ক্লিনিক্যাল নমুনাগুলো এ-রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী ভাইরাস সনাক্তকরণ ও তার বংশগতি-সংক্রান্ত প্রকৃতি নিরূপণে সহায়ক হয়েছে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় এনসেফালাইটিস-এর এক বড় ধরনের মহামারী সৃষ্টির জন্য যে ভাইরাসটি দায়ী ছিলো তার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত তবে আলাদা এক প্রকার নিপাজাতীয় ভাইরাসের কারণে এই সংক্রমণ ঘটেছে (২)। পূর্ববর্তী প্রাদুর্ভাবের সময় রক্তের সেরাম পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে রোগ-নির্ণয় করা হয়েছে; এতে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব ছিলো না। তবে বর্তমান প্রাদুর্ভাবের সময় নিপা ভাইরাসের সনাক্তকরণ ও এর প্রকৃতি নিরূপণ করার ফলে এ-কথা বলার যৌক্তিকতা বাড়িয়ে দিয়েছে যে, কথিত তিনটি প্রাদুর্ভাবই নিপা ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে কিছু স্থান রয়েছে যেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর বাহক থেকে মানুষের দেহে এ-রোগ সংক্রামিত হয় এবং এর ফলে মানুষের দেহে ব্যাপক আকারে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

ফলখেকো *টেরোপাস*-জাতীয় বাদুড় নিপা ভাইরাসের প্রধান বাহক বলে সন্দেহ এখনও বিদ্যমান (৩,৪)। চলমান তদন্ত এটি খতিয়ে দেখবে যে, বাদুড়ের দেহ থেকে সরাসরি মানুষের দেহে এ-ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছে কি না (বাদুড়ের দেহনিঃসৃত দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার ফলে কিংবা বাদুড়ে-খাওয়া ভাইরাস-সংক্রামিত ফল ভক্ষণ করে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে)। অথবা মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো প্রাণীর দেহে বিদ্যমান থেকে ভাইরাস তার বংশবৃদ্ধি করে কি না এবং সেখান থেকে মানুষের দেহে আসে কি না তা-ও পরীক্ষা করা হবে। গোয়ালন্দের আক্রান্তদের মধ্যে কিশোর ও যুবক শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য থাকায় ধারণা করা যায়, কোনো বিশেষ ধরনের কাজকর্ম এ-ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। প্রাণী পর্যবেক্ষণসহ আরো অনেক রোগতাত্ত্বিক (এপিডেমিওলজিক) গবেষণার মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের পদ্ধতি নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশে সংঘটিত পূর্ববর্তী প্রাদুর্ভাবের মতো এবারও মানুষের দেহে নিপাজনিত রোগ-সংক্রমণ ও তার বিস্তারের ক্ষেত্রে শুকরের সাহচর্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে বলে মনে হয় না, যা মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে নিপা এনসেফালাইটিস-এর প্রথম

প্রাদুর্ভাবে দেখা গিয়েছিলো (৬)। এবারের প্রাদুর্ভাবে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণের ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা আক্রান্তদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি একই বাড়িতে বসবাস করেছে কিন্তু সমানভাবে একই পরিবেশের সংস্পর্শেও এসেছে।

২০০১ সাল থেকে নিপা এনসেফালাইটিস-এর পরপর তিনটি প্রাদুর্ভাবের ফলে এ-রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য কৌশল উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ প্রশ্নের সম্মুখীন। যেসব স্থানে এ-রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, সেখানকার জনজীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নিপাজনিত রোগের বর্তমান চিকিৎসা-ব্যবস্থা 'সাপোর্টিভ' প্রকৃতির অর্থাৎ বহুমাত্রিক–এর সঙ্গে শরীরে তরল পদার্থের সতর্ক ব্যবস্থাপনা এবং শ্বাসতন্ত্রের চিকিৎসারও প্রয়োজন পড়ে। ভাইরাসনাশক ওষুধ হিসেবে রিবাভিরিন বেশ ব্যয়বহুল, যা রোগীর দৈহিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় বলে ধারণা করা হয় (৭)। অবশ্য প্রাণীদেহে ও পরীক্ষাপাত্রে (*ইন ভিটরো*) প্রয়োগের ফলাফলে দেখা গেছে, এটি ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে পারে না কিংবা রোগ-প্রশমনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না (রোলিন, সিডিসি, অপ্রকাশিত উপাত্ত)। এ-রোগের প্রতিরোধ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য রোগ-বিস্তারের পদ্ধতি-সংক্রান্ত আরো তথ্যের প্রয়োজন; *টেরোপাস*-জাতীয় বাদুড়ের মলমূত্র ও দেহনিঃসৃত তরলের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কমানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণও এই প্রতিরোধ কৌশলের অংশ হতে পারে।

পাদটিকা: ফরিদপুরে নিপা এনসেফালাইটিস-এর একটি নতুন প্রাদুর্ভাবের ওপর বর্তমানে তদন্ত চলছে। ২০০৪ সালের ২৫ এপ্রিল নাগাদ ২৪ জনের মৃত্যুসহ ৩৩ জন আক্রান্ত লোকের সন্ধান মিলেছে। এবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং কিছু রোগীর মধ্যে মারাত্মক শ্বাসকষ্টের জটিলতা দেখা যাচ্ছে যা আগের প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আইসিডিডিআর,বি ও সিডিসি-এর সমন্বয়ে পরিচালিত চলতি কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনজীবনে ও হাসপাতালসমূহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং কোন প্রক্রিয়ায় এ-রোগের সংক্রমণ ঘটছে, স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভাইরাসটির বাহক হিসেবে কোন প্রাণী প্রতিনিয়ত এটি ছড়াচ্ছে এবং কিভাবে বাংলাদেশে বিচিত্রধরনের নিপা ভাইরাসের উৎপত্তি হচ্ছে, ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার আগামী সংখ্যাগুলোতে এসবের হালনগাদ তথ্য পাওয়া যাবে। আইসিডিডিআর,বি-র ওয়েবসাইটেও (www.icddrb.org) এসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে রক্ত-আমাশয় রোগ জীবাণুর বর্ধিত প্রতিরোধ-ক্ষমতা

আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকাস্থ হাসপাতালে ডায়রিয়া জীবাণু-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ১৯৮০ সাল থেকে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে রক্ত-আমাশয় রোগ-জীবাণুসমূহের প্রতিরোধ-ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশি ও নব্বই-এর দশকে অনেক মহামারীর জন্য দায়ী *শিগেলা ডিসেন্টারি* (*এসডি১*) নামের জীবাণুটি ট্রাইমিথোপ্রিম-সালফামিথোক্সাজোল, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল এবং অতি সম্প্রতি ফ্লোরোকুইনোলোন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করেছে। এতে *এসডি১*-জনিত আমাশয় রোগের প্রাদুর্ভাবের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকাস্থ হাসপাতালের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া উপাত্ত থেকে ১৯৮০-২০০৩ সাল পর্যন্ত জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে রক্ত-আমাশয় রোগ জীবাণুসমূহ যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তুলেছে তার ক্রমবিবর্তনের গতি-প্রকৃতি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উল্লিখিত সময় পরিসরে রক্ত-আমাশয়ের চারটি জীবাণুই সনাক্ত করা হয়েছে। প্রতিবছরের পর্যবেক্ষণেই *শিগেলা ফ্ল্যাক্সনারি* নামের জীবাণুটির উপস্থিতি সর্বাধিক বলে দেখা গেছে। মোটের ওপর, ৫৭% জীবাণুই *শিগেলা ফ্ল্যাক্সনারি* বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং প্রাদুর্ভাবের পৌনপুনিকতার বিবেচনায় এর পরেই রয়েছে *শিগেলা ডিসেন্টারি*, যার উপস্থিতির হার ২১%। *শিগেলা ডিসেন্টারি* সেরোটাইপ ১, যা শিগা ব্যাসিলাস বা *এসডি১* নামেও পরিচিত, ১৯০৩-১৯০৫ এবং ১৯৯৩-১৯৯৪ – এই দুই শীর্ষ সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে (চিত্র ১)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পর্যবেক্ষণের জন্য সংগৃহীত নমুনায় *এসডি১* জীবাণু পাওয়া যায় নি, যদিও ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের কোনো কোনো স্থানে *এসডি১*-এর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে (১,২)।

চিত্র ১: শিগেলা ডিসেন্টারি *টাইপ ১-জাতীয় জীবাণুর বছরওয়ারী আনুমানিক সংখ্যা, হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ, ১৯৮০-২০০৩*

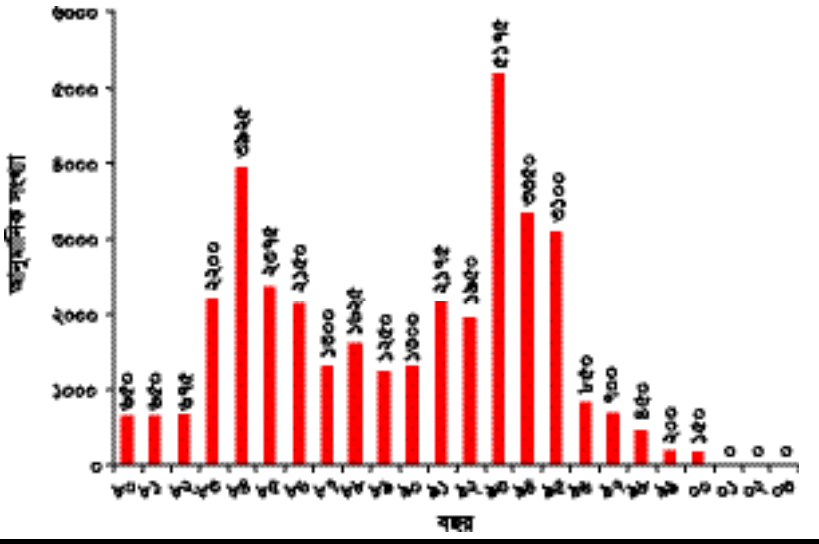

বহু জীবাণুনাশক ওষুধ যেগুলো রক্ত-আমাশয় চিকিৎসায় আগে কার্যকর ছিলো সেগুলোর বিরুদ্ধে রক্ত-আমাশয়ের সব ধরনের জীবাণুই ধীরে ধীরে প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করছে। এসব জীবাণুর প্রতিরোধ-ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি এরকম: কোনো কোনোটি একটি ওষুধের কার্যকারিতা প্রতিরোধ করে, আবার কোনোটি একাধিক জীবাণুনাশককে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে এবং এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জনের ধারাকে চলমান রাখে এবং কোনোকালেই প্রতিরোধ-ক্ষমতা হারায় নি এমন প্রমাণ দেয়। এটি কলেরা জীবাণুর ধরন থেকে ভিন্ন, কারণ কলেরা জীবাণুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, একসময়ে যেসব জীবাণু ওষুধ-প্রতিরোধী ছিলো তাদের প্রধান জাতের কোনো একটি পরবর্তী সময়ে ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে (৩)।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, টেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরামফেনিকলসহ আরো অনেক প্রচলিত ওষুধের প্রতি রক্ত-আমাশয়ের জীবাণু সংবেদনশীল ছিলো। কিন্তু ১৯৮৪ সালের মধ্যে ৯৮% *এসডি১* জীবাণুই টেট্রাসাইক্লিন-এর বিরুদ্ধে, ৮৪% জীবাণু ট্রাইমিথোপ্রিম-সালফামিথোক্সাজোল ও ক্লোরামফেনিকল (টিএমপি-এসএমএক্স)-এর বিরুদ্ধে এবং ১০% জীবাণু এম্পিসিলিন-এর বিরুদ্ধে

চিত্র ২: জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে শিগেলা ডিসেন্টারি টাইপ ১-জাতীয় জীবাণুর প্রতিরোধ-ক্ষমতার ধরন – হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ, ঢাকা, ১৯৮৩-২০০৩

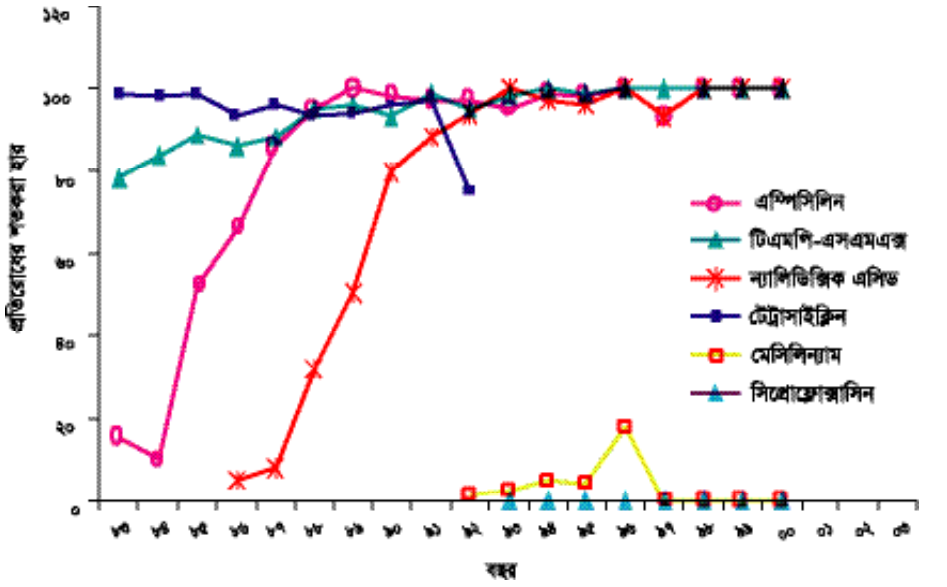

প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তোলে। ১৯৮৫ সালে এম্পিসিলিন-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ৫২%-এ উন্নীত হয় (চিত্র ২)। ১৯৯৩ সাল নাগাদ সকল (১০০%) *এসডি১* জীবাণুকেই ন্যালিডিক্সিক এসিড-এর বিরুদ্ধে, ৯৮% জীবাণুকে টিএমপি-এসএমএক্স-এর বিরুদ্ধে

এবং ৯৫% জীবাণুকে এম্পিসিলিন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে উঠতে দেখা যায়। *এসডি১* জীবাণুগুলোর মধ্যে ন্যালিডিক্সিক এসিড-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৬ সালের ৫% থেকে ১৯৯০ সালে ৮০% এবং ১৯৯৩ সালে ১০০%-এ উন্নীত হয়। এসময়ে *এস. ফ্ল্যাক্সনারি* নামের জীবাণুটিরও ওষুধ-প্রতিরোধী-ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়; যেমন: ন্যালিডিক্সিক এসিড-এর বিরুদ্ধে এ-জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৬ সালে ৪% থেকে ২০০৩ সালে ৬৬%-এ উন্নীত হয়।

এস. ফ্ল্যাক্সনারি জাতের প্রায় সকল জীবাণুই মেসিলিনাম ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-এর প্রতি সংবেদনশীল রয়ে গেছে। তবে এই পর্যবেক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হয় নি *এসডি১*-এর এমন কিছু প্রজাতি সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।

প্রতিবেদক: ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন ও ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি, ঢাকা, বাংলাদেশ

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট

মন্তব্য

এটি লক্ষণীয় যে, *এসডি১*-জনিত পূর্ববর্তী মহামারীগুলো সংঘটিত হয়েছে এমনসব জীবাণু দ্বারা যেগুলো সেসব জীবাণুনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ছিলো যা সাধারণত অতীতে কার্যকর ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: ১৯৮৪ সালের মহামারী সৃষ্টিকারী জীবাণু টিএমপি-এসএমএক্স-প্রতিরোধী হয়ে ওঠে এবং ১৯৯৩ সালের মহামারীতে এই জীবাণু ন্যালিডিক্সিক এসিড-প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। একারণে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধী জীবাণুর আবির্ভাব, যেমনটি ঘটেছে ২০০৩ সালে, তেমন বিস্ময়কর ছিলো না (১,২)। ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালের মহামারীর অনুরূপ কোনো মহামারী সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধী *এসডি১* দ্বারা সংঘটিত হবে কি না এ-বিষয়ে এখনই কিছু বলা যায় না। তবে এটি সম্ভবপর বলে মনে হয়। যদি *এসডি১*-জনিত এমন মহামারী ঘটেই, তবে যে জীবাণুনাশক ওষুধটি বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে তার নাম মেসিলিনাম। রক্ত-আমাশয়ের জীবাণুসমূহ অন্যান্য জীবাণুনাশক, যেমন জেন্টামাইসিন ও কিছু কিছু সেফালোস্পোরিনজাতীয় ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল বলে পরীক্ষায় দেখা যায়, কিন্তু বাস্তব চিকিৎসায় এগুলো কার্যকর হতে দেখা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্ত-আমাশয় *এসডি১*-বহির্ভূত এমনসব জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়, যা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-এর প্রতি সংবেদনশীল।

রক্ত-আমাশয় সৃষ্টি করে এমনসব জীবাণুর জাত ও প্রজাতিসমূহের (স্পেসিস এ্যান্ড সেরোটাইপস) এবং জীবাণুনাশকের প্রতি সংবেদনশীলতার গতি-প্রকৃতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) করে চিকিৎসার দিক-নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে এবং এসব জীবাণুর মাধ্যমে মাঝেমধ্যে সংঘটিত মহামারীর বিষয়েও ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যে মহামারী *এসডি১*-ভুক্ত এমনসব জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হবে যা ওষুধ-প্রতিরোধী কিন্তু অতীতে যার বিরুদ্ধে ওষুধ কার্যকর ছিলো।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০০৩-ফেব্রুয়ারি ২০০৪

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৩১৮)	*ভি. কলেরি* O১ (সংখ্যা=৫১৬)	*ভি. কলেরি* O১৩৯ (সংখ্যা=২৪)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪৫.১	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৯.০	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৭.৫	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৪.০	০.২	১০০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৯.০	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০.০	১০০.০
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৯৯.৮	১০০.০
ফুরাজোলিডিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.২	১০০.০

১৭২ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: জানুয়ারি-নভেম্বর ২০০৩

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারী (সংখ্যা=১৩৯)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=৩৩)	মোট (সংখ্যা=১৭২)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৭৯ (৫৬.৮)	২১ (৬৩.৬)	১০০ (৫৮.১)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১৯ (১৩.৭)	৯ (২৭.৩)	২৮ (১৬.৩)
ইথামবিউটল	৩ (২.২)	৬ (১৮.২)	৯ (৫.২)
রিফামুপিসিন	৪ (২.৯)	৪ (১২.১)	৮ (৪.৭)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৪ (২.৯)	৪ (১২.১)	৮ (৪.৭)
অন্যান্য ওষুধ	৮২ (৫৯.০)	২১ (৬৩.৬)	১০৩ (৫৯.৯)

( ) শতকরা হার
*১ মাস বা তার বেশি যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ০১, ভি. কলেরি ০১৩৯, শিগেলা এবং রোটাভাইরাসের তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০০৩-ফেব্রুয়ারি ২০০৪

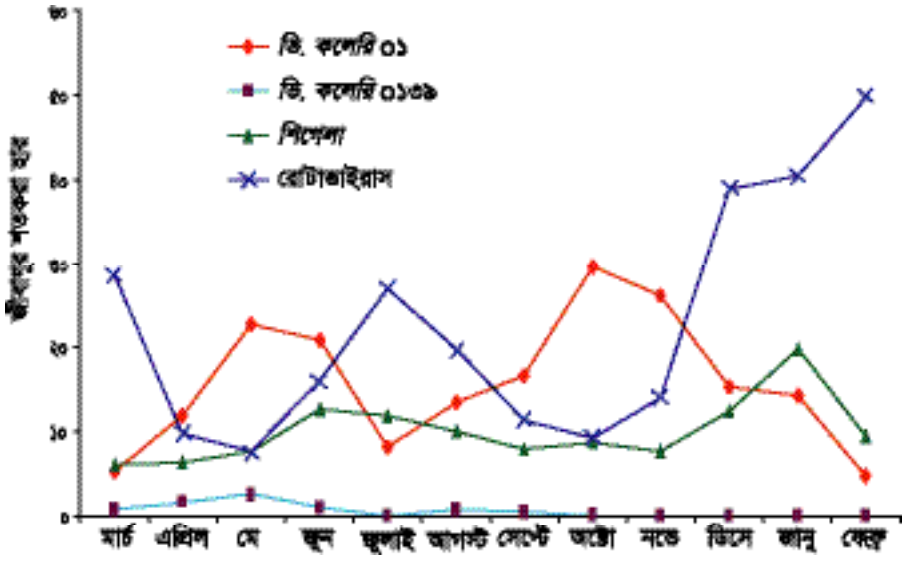

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩ (সংখ্যা=৪০)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	মাঝামাঝি কার্যকর (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এ্যাজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৫.০	০.০	৯৫.০
পেনিসিলিন	১৭.৫	৩০.০	৫২.৫
স্পেক্টিনোমাইসিন	৯৭.৫	২.৫	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	২.৫	২.৫	৯৫.০
সেফিক্সিম (সংখ্যা=২৩)	১০০.০	০.০	০.০

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে আইসিডিডিআর,বি-র অংগীকারের সাথে সহমর্মী দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আইসিডিডিআর,বি অবারিতভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, জাপান, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, শ্রীলংকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা।

ছবি: *টেরোপাস* বাদুড়, সৌজন্যে - ড. ইভান কুজমিন

সম্পাদকমন্ডলি: রবার্ট ব্রাইম্যান এবং পিটার থর্প
সম্পাদনা বোর্ড: চার্লস লারসন এবং এমিলি গারলী
কপি সম্পাদনা: সিরাজুল ইসলাম মোল্লা এবং মোঃ মাহবুব-উল-আলম
বাংলা অনুবাদ: শাহমিকা আগুন
বাংলা সম্পাদনা: এমএ রহীম এবং সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ডেস্কটপ পাবলিশিং: মোঃ মাহবুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org